International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.42-49
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.42-49

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প (নির্বাচিত): মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্ম-সঙ্কট ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চালচিত্র

মহ: গিয়াসউদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, আসাম, ভারত

Abstract:

A healthy society depends largely on a healthy economy. When war, famine, epidemic etc. deadly disease appears in the society, that society becomes paralyzed very quickly. The 1940s-50s are the most important sub-episodes of the period of British rule in the history of India. It was at this time that the last sun of British rule set, the sunrise of independent India. But this freedom of ours is accompanied by paralysis. Except some selfish politicians, none of us wanted independence by breaking the country into pieces. World War II, food crisis, cloth crisis, black market, black money and subsequent nationwide communal riots caused havoc in our national life as a result of partition and displacement of millions of people. Bloody days passed amid socio-economic and political crises. During this crisis, the Bengali nation and the middle class Bengalis have suffered the most. The poor get poorer. And the loss of the elite did not move them that way. But the most agitated was the middle-class Bengali life. During the turbulent times of the four decades, this middle class Bengali lost a lot of things - money, land, land, dignity above all morality or ideals. The moral values of people such as faith, forgiveness, love, self-respect, dignity, etc. are seen to be degraded at this time. Santosh Kumar Ghosh (1920-1984) brought out the decadence and psychosis of middle-class life in the story. Most of his more than two hundred stories are stories of middle-class Bengalis' self-crisis. E.g., 'Kanakadi', 'Jodbijod', 'Kasturi Mriga', 'Ponero takar bau', 'Chinamati', etc. In the stories, long-standing trusts are broken due to poverty, poverty leads to dark roads, marital relationships are broken, trust-distrust tensions are created, and lovers-lovers loosen up.

Key words: World War II, communal riots, morality, decadence, psychosis, 'Kanakadi',

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্বের পর্বে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপপর্ব হল চারের দশক। এই সময়-পর্বেই ইংরেজ রাজত্বের শেষ সূর্য অস্তমিত হয়, সূর্যোদয় হয় স্বাধীন ভারতের। তবে আমাদের এই স্বাধীনতা পঙ্গুত্বের সামিল। কিছু স্বার্থপর রাজনীতিজ্ঞ ছাড়া আমরা কেউই দেশকে টুকরো করে স্বাধীনতা চায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, খাদ্যসঙ্কট, বস্ত্রসঙ্কট, কালোবাজার, কালো টাকা অনতিপর

দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তারই যেন পরিণতি দেশভাগ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ।[১] আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সঙ্কটের মধ্যে অতিবাহিত হয় রক্তে লেপা দিনগুলি। এই সঙ্কটকালে দেখা গেছে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে বাঙালি জাতির, মধ্যবিত্ত বাঙালির। দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। আর উচ্চবিত্তের অর্থনৈতিক ক্ষতি খুব বেশি প্রভাব ফেলে না তাদের দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু সব থেকে বেশি আন্দোলিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন। চারের দশকের অস্থির সময়ে এই মধ্যবিত্ত বাঙালি অনেক কিছু হারিয়েছে অর্থ-কড়ি, ভিটেমাটি, জমিজায়গা, মান-সম্ভ্রম সর্বোপরি নৈতিকতা বা আদর্শ। মানুষের যে নৈতিক মূল্যবোধ তথা বিশ্বাস, ক্ষমা, ভালোবাসা, আত্ম-সম্মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির চূড়ান্ত রকমের অবক্ষয় দেখা যায় এই সময়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন নাগরিক সমাজের অবক্ষয়, রমেশচন্দ্র ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রতিফলন, তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের দুর্দশাকে পরম মমতায় অঙ্কন করলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের জৈব প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজের অবক্ষয়কে তুলে আনলেন গল্পে। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৪) গল্পে তুলে আনলেন মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও মনোবিকলনকে।[২] তাঁর দ্বি-শতাধিক গল্পের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মসংকটের গল্প। দেখা যায় দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস ভেঙে যায় দরিদ্রতার কারণে, অভাবের টানে বেছে নিতে হয় অন্ধকারের রাস্তা। ভেঙে যায় দাম্পত্য সম্পর্ক, তৈরি হয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন। শৈথিল্য আসে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে।

দরিদ্রতার কারণে কেমনভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হয়, কেমন করে নৈতিকতার সূত্রে বাঁধা দাম্পত্য সম্পর্কে মুহূর্তের মধ্যে ফালা ফালা হয়ে চির ধরে তারই গল্প 'কানাকড়ি', 'জোড়বিজোড়', 'কস্তুরী মৃগ', 'পনেরো টাকার বউ', 'চীনেমাটি', 'গিল্টি', 'সমীকরণ', 'হোলি', 'বিষকণ্ঠ' ইত্যাদি। 'কানাকড়ি' গল্পের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মন্মথ-সাবিত্রী আহিরিটোলার গলিতে ভাড়া-বাড়িতে থাকে। সংসার চালাতে অফিসের পাশাপাশি দুটি টিউশনও করতে হয় মন্মথকে। পাশেই ভাড়া নিয়ে থাকে অভিনেত্রী মল্লিকা। তৎকালীন সময়ে নারীদের সিনেমায় অভিনয় করা ছিল ভদ্রস্থঘরের কাছে অশ্লীল কাজ। 'আমাকে তুমি চেনো। আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের দাম থাকলেই হল।'[৩] এমন বিশ্বাসের খুঁটিতেই ভর করে আছে মন্মথ-সবিত্রীর সংসার। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ইত্যাদি কারণে আসে অর্থনৈতিক মন্দা। অফিস থেকে শুরু করে সর্বত্রই কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়। চাকরি চলে যায় মন্মথেরও। এখন একবেলা খেয়ে দিন কাটে তাদের। চাকরির খোঁজে প্রতাড়িত হয় সর্বত্র। তথাপি তখনো এদের মূল্যবোধের কোনরূপ অবক্ষয় দেখা যায় নি।

সিনেমা দেখা, সিনেমা করা তাদের কাছে ছিল ঘৃণ্যকাজ। সে জন্য সিনেমায় কাজ করা মল্লিকাকে তারা একরকম ঘৃণাই করেছে। কিন্তু আমরা দেখি দৈনের কাছে এই মন্মথদের মূল্যবোধ বেশি দিন টিকে না। সাবিত্রী সিনেমা দেখে শশাঙ্ককে পাশে নিয়ে সিনেমায় ছোট একটা চরিত্রে অভিনয়ের কাজ জুটবে বলে। কাজ না জুটাতে পারলে মন্মথ ক্রুদ্ধ হয়। শশাঙ্কের গাড়িতে সাবিত্রী বাড়ি না ফেরায় কাজ জুটে না বলে মন্মথ সাবিত্রীকে দোষারোপ করে। যে মন্মথ আগে স্ত্রীর রোজগারে খেতে চায় নি আজ সে স্ত্রীর রোজগারের দিকেই চেয়ে থাকে। সতী- সাধ্বী সাবিত্রীকে দায়ী করে সে বলে—

> 'ওরা আমুদে লোক, একটু ফূর্তি চায়। খুশি হলে উপকার করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে।'[৪]

দরিদ্রতার কাছে হেরে গিয়ে মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়ে মন্মথ সাবিত্রীকে অসতী করতে চায়। স্বামীর প্রতি সাবিত্রীর অবশিষ্ট বিশ্বাসটুকু ভেঙে যায়—

> 'এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেল।'[৫]

'পনেরো টাকার বউ' দরিদ্রতার জন্যে অপমানিত নারীর প্রতিহিংসাপরায়ণের গল্প। বিএ পাশ গৌরাঙ্গ একটা কোম্পানির সেলস অর্গানাইজারের কাজ করত। সেই মাইনেতে সংসার চলত না বলে চল্লিশ টাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ছেড়ে কৃষ্ণধামে পনেরো টাকায় ঘর ভাড়া নেয়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চাকরি হারালে গৌরাঙ্গ ছয়মাসের ঘর ভাড়া বাকি রেখে গোপনে চলে আসে বস্তিতে। এখানে এসে সে থিয়েটার, ফিল্মের চাকরির খোঁজ চালায়। এসব চাকরি ভদ্রস্থ পরিবারের পক্ষে অসম্মানের হলেও দরিদ্রতার কারণে মণিমালা মেনে নিয়েছিল। দু-মুঠো ভাত জোগাড় করা ঈশ্বর দর্শন বলে প্রতিপন্ন হয় এমন সঙ্কটকালে গৌরাঙ্গ কোনো কাজ না পেলে মণিমালা খোঁজ করতে বলে ভদ্রস্থ চাকরির—

> 'থিয়েটারের আশা ছেড়ে দাও, অন্য কাজ দেখ। যা-হোক একটা ভদ্রলোকের চাকরি।'[৬]

অর্থের অভাবে গৌরাঙ্গের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। বস্তিতে সে অন্যলোকের সাথে খারাপ ভাষায় কথা বলে, থিয়েটারে অভিনেত্রীর হাত ধরে টানাটানি করে। অন্যদিকে দরিদ্র বলে আশি টাকার-ষাট টাকার-চল্লিশ টাকার-ত্রিশ টাকার বউদের কাছে মণিমালারা ঘৃণ্য। এই ক্ষোভ থেকেই ভদ্রস্থ ঘরের মণিমালা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। চালাকি ও মিথ্যার দ্বারা সংসার ভেঙে দেয় আশি টাকার বউয়ের, ধনী পরিবারে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া সুস্মিতার বিয়ে ভেঙে দিয়ে ষাট টাকার দিদির অহঙ্করকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেয়েছে।

'চীনেমাটি' গল্পে উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্কটকে নির্মাণ করলেন গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ। নিম্নমধ্যবিত্তের প্রাণকৃষ্ণ-বকুলের বস্তিতে থেকে ছাপাখানায় কাজ করে কোনোরকমে দিন চলে। তাদের আত্মসম্মান আছে পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সিনেমা দেখা এদের কাছে গর্হিত কাজ। বকুল একবার সিনেমা দেখলে প্রাণকৃষ্ণ তাকে মারধরও করে। তবে তাতে বকুলের অন্তরাত্মা কষ্ট পায়নি। সেজন্য হাতে মারের দাগ দেখে কুঞ্জ প্রশ্ন করলে সে বলে—

> 'দূর বোকা। এসব দাগ অন্য জিনিসের। তুই বুঝবি না। … এ হল ভালবাসার। ভালবাসারও আঁচড় হয় বুঝলি।'[৭]

কিন্তু দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারিসহ অন্যান্য কারণের জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হলে তাদের সংসারে নেমে আসে দরিদ্রতার কড়ালগ্রাস। প্রাণকৃষ্ণ নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ছাপাখানার শিসা চুরি করতে গেলে ধরা পড়ে যায় এবং তার একমাত্র উপার্জনের পথটিও বন্ধ হয়ে যায়। ধনী ব্যবসায়ী সুবোধ চক্কোতির কাছ থেকে ফেরিওয়ালার কাজ পাবার আশায় স্ত্রীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। যে একদা সিনেমা দেখাকে জঘন্য মনে করত সেই প্রাণকৃষ্ণই স্ত্রী বকুলকে পাঠিয়ে দেয় সুবোধের সাথে সিনেমা দেখতে। একাকী ঘরে থাকা সুবোধের কাছে পাঠিয়ে দেয় বকুলকে। কিন্তু আত্মসম্মানী বকুল সুবোধকে নানাভাবে অপমানিত করে বেড়িয়ে পড়লে স্বামী 'সতি-নকখি!' বলে গঞ্জনা দিয়ে বলে—

> 'কী খোয়া যেত তোমার সুবোধের কথাটা রাখলে। আর মাসখানেকের মধ্যেও একটা কাজ যদি জোটাতে না পারি, তখন কোথায় থাকবে তোর এত তেজ। বেশ্যাবিত্তি করেও কুল পাবিনি।'[৮]

দরিদ্রতা কাছে সমস্ত ধরণের মূল্যবোধগুলি বিসর্জন দেয় প্রাণকৃষ্ণ। এমনকি স্ত্রী পরের মানসসঙ্গী করে তুলতেও তার বিবেক বিন্দু মাত্র দংশিত হয় না। একসময় দরিদ্রতা ও স্বামী প্রাণকৃষ্ণের তিক্ত গঞ্জনার কাছে হার মেনে যায় বকুল। সে তার সম্ভ্রমবোধ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। সে সুবোধের গাড়িতে চড়ে বেড়ায় দূরে অনেক দূরে যেখানে দুটি শরীর একত্রিত হবে পরিবর্তে প্রাণকৃষ্ণ পাবে বেঁচে থাকার রসদ।

অপরদিকে, উচ্চমধ্যবিত্তের মেমসাহব ইন্দ্রাণীর স্বামী মি. চৌধুরী শেয়ারের খেলায় সমস্ত সম্পত্তি নিমেষেই হারিয়ে ফেলে। চলে যায় আভিজাত্যময় জীবন। মেমের শরীর আর সুসজ্জিত থাকে না নানারূপ মোহনীয় অলঙ্কারে। যে স্বামী মেমকে দিয়েছিল অবাধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজ অর্থাভাবে সেইই স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত চায় খরচ-হিসাবের। এ নিয়ে উভয়ের বচসা হয়। অঢেল ঐশ্বর্যই এদের পারস্পারিক ভালোবাসার সূত্র ছিল। দৈন্যের দায়ে আজ সমস্ত কিছু মাটির সাথে মিশে গেছে। ইন্দ্রাণী তাঁর বাক্সের চাবি দিতে না চাইলে মি. চোধুরীর মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে অহমিকা ও নিষ্ঠুরতা । স্ত্রীকে অপমান করে বলে—

> 'এর কোন জিনিসটা তোমার? সংসার খরচের টাকার কথা ছেড়ে দাও। এই মুহূর্তে তোমার বাক্সের চাবি ছিনিয়ে নিতে পারি। দেখতে পারি কত আছে তোমার পাশ বইয়ে। এমন কি, এক টানে ছিঁড়ে নিতে পারি তোমার কানের ওই বার্লিংটনের বাড়ির জড়োয়া দুল—'[৯]

মি. চৌধুরী স্ত্রীকে নানাভাবে অপমানিত করে তার মান-মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। আবার প্রয়োজনে প্রাণকৃষ্ণের মতো স্বার্থপর চৌধুরী স্ত্রীকে টোপের মতো ব্যবহারও করে। বোম্বাইয়ের ধনী সিনেমা ব্যবসায়ী মতিলালের সাহায্য পাবার আশায় সে সুকৌশলে স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে এগিয়ে দেয় তার কাছে। কাজ হাঁসিল করতে কুবের ব্যবসায়ীকে নিমন্ত্রণ জানান হয়। আর ইন্দ্রাণী সুসজ্জিত হয়ে খাওয়ার টেবিলে তার পাশে বসে মি. চৌধুরী সাহেবের ইশারায় যার—

> 'যার ভুড়ি ঠেকেছে প্লেটের কিনারে, রোমশ একটি হাতের চার আঙুলে চারটি আংটির ঝিকিমিকি।'[১০]

মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীর হাতে মতিলাল হাত ঠেকায় কিন্তু ইন্দ্রাণী হাত সরিয়ে নেয় না। মতিলাল তাকে সিনেমার নায়িকা করতে চাইলে ইন্দ্রাণী তাতে রাজি হয়ে যায়। এইভাবেই দৈন্য-দুর্দশার কবলে প্রাণকৃষ্ণ-বকুল, মি. চৌধুরী-ইন্দ্রাণীদের দাম্পত্য জীবনে চিঁড় ধরে যায় চিরকালের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অবমূল্যায়ন ঘটে দরিদ্রতার করালগ্রাসে।

বিশ শতকের চারের দশকের সঙ্কটকালে অনেক মানুষ দুর্বল মানুষকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছে তারপর অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ছলনাময় প্রেমের আশ্রয় নিয়ে ব্যবহার করেছে নারীদের। অর্থাভাবে সংসারের সবচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে অথবা ভবিষ্য-সংসারের কথা ভাবে প্রেমিকের হাত ধরে পাড়ি দিয়েছে শহরে। আর সেখানেই অনেক নারীর স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। ইজ্জত হয়েছে ভূলণ্ঠিত। এমনই একটি গল্প 'ঘর'। জলধরের হাত ধরে গ্রাম্য বিধবা কৃষ্ণকুন্তলা পোড়া ঘর নতুন করে বাঁধতে চেয়েছিল। জলধর কলকাতায় ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিয়ে আসে বড় শহরে। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভালোবাসার অভিনয় করে জলধর। কিছু রোজকার হয়ে গেলে সেই টাকা পয়সায় অন্য

কোথাও গিয়ে বিয়ে করে থাকবে মিথ্যা আশা দিয়ে বলে কলকাতায় তাকে নিষিদ্ধকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মন থেকে সমর্থন না থাকলেও ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয়ে কৃষ্ণকুন্তলা মেয়ে হোস্টেলে থেকে কিছু মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে কমিশনের বিনিময়ে এক একটি মেয়েকে অন্ধকারের রাস্তায় ঠেলে দেয়। কিন্তু একসময় তার স্বপ্নের নীড় ভেঙে চুড়মার হয়ে যায় যখন জানতে পারে জলধর পূর্ববিবাহিত। 'কেন ভুলিয়েছ আমাকে?' বলে সে কৈফিয়ত চাইলে নির্লজ্জ জলধর এর জন্য তাকেই দায়ী করে নিজে ভাল সাজতে চেয়েছে—

> 'আমি ভোলাইনি, ভুলেছ তুমিই। আমি বড়োজোর একটুখানি লুকিয়েছি। কিন্তু সে-ও তোমার ভালর জন্যেই।'[১১]

চুড়ান্ত রকমের প্রতারণার পর পাপের টাকায় হত-দরিদ্র সুরেনের বিয়ে দিয়ে তার 'ঘর' নির্মাণ করে কৃষ্ণকুন্তলা নিজের মহাপাপ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

শুধু দরিদ্রতার জন্য নয়, স্বচ্ছলতাও যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় তার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ 'শরিক' গল্পে। সারারাত ডিউটি করে সুধাময় অবসর সময়ে যে লেখালেখিটুকু করে তাতেও কিছু অর্থ উপার্জিত হয় দেখে স্ত্রী উমা আনন্দে আত্মহারা। লেখক হিসাবে সুধাময়ের পরিচিতি বাড়িয়ে দেয় উমার খুড়তুতো বোন নীলিমা। প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত কাজেই নীলিমা সুধাময়কে সাহায্য করে। গর্ভবতী উমা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে নীলিমা সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ধীরে ধীরে নীলামার সঙ্গে সুধাময়ের প্রেমে সম্পর্ক তৈরি হয়। সুধাময়ের জীবন পালতোলা নৌকার মতো তর তর করে এগিয়ে চলে। লেখক হিসাবে তার নাম –যশ-খ্যাতির শিখর বেড়েই চলে। তার গল্প-উপন্যাস নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়। এই সুবাদে রূপালি জগতের সাথে একটু একটু করে পরিচিত হয় সে। নায়িকা অলকা মুখার্জির সাথে পরিচিত হয় এবং তার রূপে ও যৌবনে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায় সুধাময়। একসময় তাকে বিয়ে করবে বলে গোপনে স্ত্রী,পুত্র ও নীলিমার অন্তরালে গৃহ ত্যাগ করতে গেলে নীলিমার হাতে ধরা পড়ে যায়। নীলিমা অলকাকে 'বেশ্যা' বলে অপমান করে সুধাময়কে আঘাত করতে চেয়েছে। কিন্তু সুধাময় তার দ্বিগুণ অপমান করে প্রতিশোধ নিতে চেয়ে বলেছে—

> "… অলকা অভিনেত্রী বটে, কিন্তু অভিনয় একটা শিল্প, অলকা শিল্পী তুমি কী?[১২]

আবার এও বলে—

> 'তুমি কে, কী তোমার পরিচয়? ইস্কুলে মাস্টারি করো আর আমার পেছনে ফেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াও। তোমার সঙ্গে অলকার কীসের তুলনা?"[১৩]

সুধাময় ভুলে যায় সে যথার্থ 'শিল্পী'র' পরিচিতি পেয়েছিল নীলিমার জন্য। কিন্তু যশলোভে ও নারী-লোভে সে অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। এক সময় নীলিমাকে পেয়ে নিজের স্ত্রীকে মনে হয়েছে 'ফ্যাকাশে টিংটিঙে' ও 'বীভৎস'। আর আজ অলকাকে দেখে নীলিমাকে মনে হয়েছে 'কাঁকলাস'। হয়তবা অন্য কোনদিন অন্য কোন মেয়ের প্রেমে সন্তরণ দিতে গিয়ে অলকাকে ভয়ঙ্কর বা কুৎসিত বলে সুধাময়ের মনে হবে। অর্থ ও যশে সুধাময় মানবিক মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়েছে। নৈতিকতার অবক্ষয়ের এক উজ্জ্বল উদাহরণ সুধাময়।

'দ্বিজ' গল্পটি আমাদের অন্য এক সমাজবাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সন্তোষকুমার ঘোষ। গল্পটির প্রেক্ষাপটের মূলে রয়েছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু জীবন। দাঙ্গা উদ্বাস্তু হওয়া এক অসহায় দরিদ্র

ব্রাহ্মণের আত্মসংকটের গল্প। ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসে সাম্প্রিদায়িক দাঙ্গার সময়। সে ও তার স্ত্রী নয়নতারার স্থান হয় ক্যাম্পে। পূজা-আর্চনা তার শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের অবলম্বন মাত্র নয়, এর সাথে সামাজিক সম্ভ্রমও জড়িত । কিন্তু পূজারি হিসাবে সে নাম ও খ্যাতি কোনটিই উপার্জন করতে পারে না বলে বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজ করে। কিন্তু ক্যাম্পের মানুষ তাকে পূজারি হিসাবেই জানে, জানে সংসার চালানোর জন্য তার একমাত্র অবলম্বন মন্ত্রপাঠ। বিড়ি বাঁধায়ের কাজেও যখন সংসার চলে না তখন অর্জুন-সনাতন-ভৈরবদের নিয়ে পানের দোকান খুলে। নিশিকান্ত সুন্দর পান বানাতে পারলেও ক্যাম্পের মানুষ যখন তার কর্মক্ষত্র জেনে যায় তখন স্ত্রী নয়নতারার সামনেই নিশিকান্তকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করে—

> ‘স্বস্তিপাঠ! নিশিকান্ত ঠাউরের চণ্ডিপাঠের নমুনা আজ দেইখা আসলাম দমদমায়। পানবিড়ির দোকান দিছে আমাগো চক্কোত্তি। পান সাজে, আর পয়সা পয়সা খিলি বেচে।’[১৪]

স্ত্রী একথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী বলেছিল তা নিশিকান্তকে জানায় এইভাবে—

> ‘আমিও কইছি ককখনও না। পান সাজনের মতো ছোট কাম করতেই পারো না তুমি। দ্যাশের চিনা-শুনা লোক দোকান দিছে, তুমি খালি দাঁড়াইয়া থাইকা দেখা শুনা করো। তোমারে যে পান-আলা কয় তার জিহ্বা যেন খইসা পড়ে।’[১৫]

স্ত্রীর মুখে ‘পান সাজন’ ‘নিচু কাম’ শুনে নিশিকান্ত স্ত্রীর দ্বারাই বেশি অপমানিত বোধ করে। সে বলে—

> ‘আমারে পান-আলা কইয়া যত না অপমান করছে মন্মথ, পান সাজনেরে নিচা কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি।’[১৬]

অশ্রদ্ধা ও অনাদর পেয়ে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়া নিশিকান্ত স্ত্রীর হাত থেকেও রেহাই পায়নি যদিও অজান্তেই নয়ন্তারা এমন বলে ফেলেছে। তথাপি দরিদ্র হলেও মানসম্ভ্রমবোধ ছিল বলেই মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দরিদ্র নিশিকান্ত।

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘গিল্টি’ গল্পেও ছড়িয়ে রয়েছে নানা অনুষঙ্গ। এই গল্পে রয়েছে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হওয়া দুই পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই। অর্থের প্রয়োজনে বিসর্জন দিতে হয় ভয় লজ্জা ও সম্ভ্রম। প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসার স্থলে চলে আসে টিকে থাকার প্রয়োজনে সওদা। স্টিমার কোম্পানির কাজ করতে সলিল বিধবা বোন ও বোনের ছেলেকে নিয়ে কলকাতা চলে আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তার সে চাকরিও এক সময় চলে গেলে বেকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তার প্রেমিকা সীতার বাবার মাস্টারির চাকরি চলে গেলে বড়ো বড়ো মেয়েদের কলকাতায় গিয়ে ওঠে টালির বাড়িতে। বেকার হওয়ার কারণে সীতার বাবা বেকার সলিলের সাথে সীতার বিবাহের কথা তোলে না। অথচ অভাবের সংসারের দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে দিনের পর দিন সীতা নিজের কাজের খোঁজ করতে বলে বেকার সলিলকে। প্রতিদিন একই প্রশ্নে তিতবিরক্ত হয়ে সলিল সমাজনিষিদ্ধ কাজের কথা উত্থাপন করে—

> ‘চাকরি, মানে কিছু টাকা রোজকার করতে চাও এই তো? একটা খোঁজ দিতে পারি, রাজি ? তাতে আমারও হয়ত কিছু থাকবে ?”[১৭]

একথার গোপন মানে সীতা বোঝে। ‘ছোটলোক’ বলে সে গালিও পারে। কিন্তু দৈনের কাছে হেরে গিয়ে এই কাজেই ‘শরীর পসারীর’ কাজে রাজি হয়। সীতার সাথে বিবাহ হবে না জেনেই প্রেমিকার শরীরের সাথে

করে সওদা। সেই সওদায় থাকে পারস্পারিক অবিশ্বাস, ভাগবাটোয়ারা নিয়ে শুরু হয় পরস্পরকে ঠকানো। খদ্দের আগরওয়ালার দেওয়া ত্রিশ টাকার কোন ভাগই সীতাকে না দিয়ে টাকা জাল বলে তাকে প্রতাড়িত করে। অন্যদিকে খদ্দের খাস্তগীরের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সোনার কানের জিনিসের ভাগ না দিয়ে 'গিল্টি'র জিনিস বলে সলিলকে সে প্রতাড়িত করে। দরিদ্রতার কাছে ভালোবাস পরিণত হয় ব্যাবসায়। বিশ্বাসের রূপ বদলে যায় প্রতাড়নায়। যে সীতার শরীর,মনকে চূড়ান্ত রকমের ভালোবেসে ছিল সলিল সেই সীতার মন বলে কিছু বাকি থাকে না, থাকে শুধু শরীর। তার শরীর উভয়ের পেটের ভাত জোগাড়ের অবলম্বন হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ, নৈতিকতার এমন অবক্ষয়ের গল্প বাংলা সাহিত্যে খুবই কম আছে বলে মনে হয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'দুই কাননের পাখি', বিষকণ্ঠ', 'একটি কাপ্তানের কান্না', 'সে আমার প্রেম', 'একটি চরিত্র একটু দিন' ইত্যাদি গল্পের কাহিনি জুড়ে রয়েছে নৈতিকতার অবনমন। এবং এসবের মূলে রয়েছে চাকরির সংকুলানজনিত বেকার সমস্যা। একদিকে যেমন 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে চিৎকার শোনা গেছে অন্যদিকে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে চাকরি দাও, কাজ দাও। আজ দেশ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পার করে ফেলেছি। সেই সঙ্গে অতিক্রম করিছে সেই অন্ধকারের দিনগুলি। আজ একবিংশ শতকে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর সিনেমা-থিয়েটার দেখা কিংবা সেখানে অভিনয় করাকে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করা হয় না। অথবা পূজারিরপানের দোকান দেওয়াকে ছোট কাজ বলে মনে হয় না। কিন্তু উল্টোদিকে সতী-সাধ্বী ধারণাও অনেক বদলে গেছে। তারপরও অনেক ভ্রান্তি ধারণার এখনো পূর্ণ নিরসন হয়নি। তাই আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন 'কিনু গোয়ালার গলি'র স্রষ্টা সন্তোষকুমার ঘোষ।

তথ্যসূত্র:

১) কামালুদ্দীন আহমদ, 'বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগের প্রভাব', খনন (সাহিত্য পত্রিকা), বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৪৫।
২) দীপেশ মন্ডল, 'কানাকড়ি ও চিনেমাটি: ছাপোষা বাঙালি জীবনের সংকট', বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা: বিশ শতক (শ্রাবণী পাল সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০০৮, পৃষ্ঠা: ২৪১।
৩) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'কানাকড়ি', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৬৮।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৯।
৫) তদেব।
৬) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'পনেরো টাকার বউ', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ১৬৭।
৭) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'চীনেমাটি', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭। পৃষ্ঠা: ২২৫।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩০।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩২।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩৩।
১১) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'ঘর', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২৪২।
১২) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'শরিক', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২৬২।
১৩) তদেব।
১৪) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'দ্বিজ', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২৯০।
১৫)তদেব।
১৬) তদেব।
১৭) সন্তোষকুমার ঘোষ, 'গিল্টি', গল্পসমগ্র (১), দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৩০৩।